OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 197 - 207
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

‘নষ্টনীড়’-র বৃত্তান্ত : জীবনানন্দ দাশের কথাসাহিত্য

অধ্যাপক অচিন্ত কুমার ব্যানার্জী
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদা
Email ID : prof.achinta007@gmail.com
ও
মৌসুমী সাধুখাঁ
গবেষক, বাংলা বিভাগ
গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sadhukhanmousumi24@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Jibanananda Das, reproduction, marriage, fiction, autobiographical, era's pain,

Abstract
Institutions like family, marriage, etc., have been established along the path of social evolution. In this context, marital relationships have developed with the aim of fostering mutual understanding and reproduction between men and women. This concept has not only been confined to social evolution or relationships but has also found a place in various themes within the realm of literature. In modern literature, particularly in Bengali fiction, the theme of ‘marriage’ has been extensively explored. In the post-Tagore era, during the "Kallol" period, an exceptional trend emerged in fiction—yet, Jibanananda Das stood apart even from this trend. It was only several decades after his death that readers began to recognize the fiction writer Jibanananda Das, who was primarily known as a poet of the Kallol era.

This article discusses various facets of marital relationships as reflected in Jibanananda Das’s short stories and selected novels (such as Malyaban). For the convenience of analysis, different dimensions of marriage portrayed in his short stories are addressed separately. The characters in his novels and short stories have been examined in parallel with the tendencies of the poet Jibanananda Das's psyche. It goes without saying that most of the characters created by Jibanananda Das as a fiction writer are connected to autobiographical elements. The main article discusses, with supporting information, how the author and his characters navigated the pain and impact of their era.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

তৈত্তিরিয় ব্রাহ্মণের শ্লোকে (২/২/৫) বলা হয়েছে যিনি পত্নীহীন তিনি যজ্ঞাধিকার বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে ষোলটি সংস্কারের মধ্যে বিবাহ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার। বিবাহের মাধ্যমেই মানুষ পূর্বপুরুষের ঋণ শোধ করতে পারে। ঋণ শোধ হয় সন্তানের মধ্যে দিয়ে। বৌদ্ধধর্মানুসারে বিবাহের মূল ভিত্তি – 'Understanding respecting each-others beliefs and privacy.' [(A Happy Married life : A Buddhist Perspective — Ven. K. Shri Dhammananda. Access to insight (BCBS Edition), 30 November 2013)] খৃষ্ট ধর্মে বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য নতুন সৃষ্টি। ইসলাম ধর্মে বিবাহ একটি চুক্তি – যার সঙ্গে প্রজনন বিষয়টি জড়িত। সোস্যাল সাইন্সে 'সুখ' বা 'happiness', জীবনের তৃপ্তি বা নিজের ভালো থাকা সমার্থক। বিবাহ যৌথ দায়িত্ব – পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য, শ্রদ্ধার, ভালোবাসার বন্ধন – ফল সন্তান, সন্তানের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসার বেঁচে থাকা। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তবে সিদ্ধান্তে আসাই যায় —

১. বিবাহের মাধ্যমে নরনারীর স্থায়ী যৌন সম্পর্ককে বৈধতা দেওয়া।
২. সন্তান-সন্ততির দ্বারা ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরি করে দেওয়া অর্থাৎ সৃষ্টিধারা অব্যহত রাখা।
৩. নরনারীর পারস্পরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।
৪. বৃদ্ধ বয়সে বা অসুস্থ অবস্থায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা।

স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণ, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ইত্যাদি অনেকগুলি বিষয়ের ওপর 'দাম্পত্য-সুখ' নির্ভর করে। 'দাম্পত্য-সুখ' বিষয়টি বিমূর্ত ভাবনা।

'দাম্পত্য' বিষয়টিকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরবর্তীকালের কথাসাহিত্যিকরা কিছু গল্প-উপন্যাস লিখেছেন। এই সূত্রে জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি নির্বাচিত ছোটগল্প এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসে দাম্পত্য জীবনের বৃত্তান্ত, সুখ-অসুখের সন্ধানই বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। কবি জীবনানন্দ তাঁর স্বভাব ও মনোধর্ম মতোই সমকালীন প্রচারধর্মীতা থেকে দূরে ছিলেন এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে বস্তুবিশ্বের স্থূলতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছিলেন - কবিতায় আংশিক সাফল্য এলেও, কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে স্বীকার করতে খানিকটা বাধ্য হয়েছিলেন। জীবিতাবস্থায় কবি হিসেবে স্বতন্ত্র স্বীকৃতি জীবনানন্দ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর অমূল্য কথাসাহিত্যের সন্ধান ও স্বরূপ উন্মোচনের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হল আরো অনেক বছর। তাঁর কবিতার পাশাপাশি কথাসাহিত্যও যে স্বাতন্ত্র্য ও শক্তিতে অনন্য সে কথা বর্তমানে প্রমাণিত। প্রতিষ্ঠিত কবি জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের জগৎ অনালোকিত ছিল সম্ভবত কবির ইচ্ছাক্রমেই। জীবনানন্দ দাশ মনে করতেন মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে হলে অনেকখানি সময়ের প্রয়োজন, জীবনকে ভালো করে বুঝে পরিষ্কার তাৎপর্য দেখে, তবেই বড় সাহিত্য তৈরি হয়।

প্রায় বাইশটি উপন্যাস, একশোর্ধ ছোটগল্প লিখেছিলেন জীবনানন্দ – যেগুলি ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধু পরিমণ্ডলেও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। উত্তরাধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে জীবনানন্দ পৃথক মাত্রা সংযোজন করেছেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৪ – পর্বে দাম্পত্য জীবনের শুরুতে দারিদ্র ও তজ্জনিত মানসিক বিমর্ষতা (সংসার সম্পর্কে সর্বত্র উপেক্ষিত জীবনানন্দের কবি সত্তা), সেই মানসিক বিমর্ষতা থেকে উত্তরণের প্রচেষ্টা – যার প্রতিফলন তাঁর কথাসাহিত্যে সর্বত্র। উপন্যাস জীবনানন্দের কাছে 'বৈচিত্র্যময় আত্মজীবনী'। কিছু গল্প এবং উপন্যাস অসম্পূর্ণ ছিল, অনেক ক্ষেত্রেই নামকরণ করেননি – এক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ততাকে দায়ী করা যায়। 'রূপসী বাংলা' কাব্যগ্রন্থও ১৯৩৪ সালে লেখা, প্রকাশ পায় কবির মৃত্যুর পর – এখানেও হয়তো সেই দ্বিধা। ব্যক্তি জীবনের দুঃসময় এবং মানসিক দীনতাকে অতিক্রমের জন্য কথাসাহিত্যের জগতে কবির বিচরণ। কবির অন্তরস্থিত গভীরতম ভাবলোক ক্রমাগত একসময় একা করেছে তাঁকে। নষ্ট-দাম্পত্য, নিষ্ফল-জীবন থেকে ভিন্ন এক কাম-রণ-রক্ত-যশ-সফলতা — 'বোধ'-র জগতে কবির যাত্রা। পাকে-চক্রে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় রত হয়েছেন – বস্তুবিশ্বের স্থূলতাকে অতিক্রম করতে চেয়েও ফিরতে হয়েছে সেই বস্তুতেই। ফিরতে না চেয়েও ফিরে আসার দ্বন্দ্ব, পেশাগত জীবনের সংকট, ব্যক্তি জীবনের অনুভব প্রকাশ পেয়েছে কথাসাহিত্যে। প্রচণ্ড স্নায়ুচাপের মধ্যে দিয়ে সময় কাটছিল, জীবিকা ও পেশাগত বাস্তবতাই এই চাপের মূল কারণ। সঙ্গে তাঁর প্রবণতা, বিশ্বাস, আচরণ, সমষ্টিগত বিন্যাস, সমাজ ও রাষ্ট্রগত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাপ ইত্যাদি যুক্ত হয়ে পুরো বিষয়টি হয়ে উঠেছিল বহুধাবিস্তৃত ও আপাত দুর্বোধ্য। সংবেদনশীল

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রোমান্টিক স্বপ্নলোকে বিভোর কবি প্রকৃতিমগ্ন হতে আগ্রহী। বাস্তবের নারীতে সুধা না পেয়ে সন্ধান করে ফিরেছেন কল্পনার নারীকে – The real কিশোরী or something materially poor but spiritually rich. জীবনানন্দের কথাসাহিত্যের একটা বড় অংশ জুড়ে আছে দাম্পত্য-চিত্র। সেখানে মনস্তত্ত্বের জটিল দ্বন্দ্বে পীড়িত পুরুষের দাম্পত্যে প্রবল অনীহা – শুধুই টিকিয়ে রাখার দায়, আত্মসংকটে জর্জরিত, অসহায়, পরিস্থিতির শিকার। তাদের বিশিষ্ট বোধের জগৎ এবং বাস্তবের দুনিয়া বিপরীতে চলে — একটা টানাপোড়েন সবসময় চলতে থাকে।

বিবাহ শুধু মন্ত্রপাঠ, রেজিস্ট্রি, সহবাস, সন্তান উৎপাদন নয় – 'দাম্পত্য-সুখ' বিষয়টি খুব গুরুত্বের দাবীদার। 'দাম্পত্য-সুখ' নির্ভর করে অনেকগুলি বিষয়ের ওপর – স্বামী-স্ত্রীর যৌথ আশা পরিপূরণ, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস, ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, নির্ভরতা ইত্যাদি। 'বিবাহ' জীবনের বড় চ্যালেঞ্জ, সবচেয়ে বড় দৈব ঘটনা বা দুর্ঘটনা। ভারতীয় 'দাম্পত্য-নীতি' মূলত আধ্যাত্মিকতা নির্ভর। ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ – এই চার পুরুষার্থ লাভ করতে দরকার স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রয়াস। সৃষ্টি ধারা অব্যাহত রাখার উৎসবও এই বিবাহ। যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বিবাহের উদ্দেশ্য ত্রিবিধ – আনন্দ উপভোগ, পুত্রলাভ এবং ধর্ম লাভ। 'মহাভারত' থেকে 'মনুসংহিতা' সর্বত্র নারী পুরুষের অধিগত; মন্ত্র ও নিজের দেহের অধিকার থেকে বঞ্চিত। নারীর হীনতা ও পুরুষের শ্রেষ্ঠতা নিয়ে যে দাম্পত্য তার উৎস আধিপত্যধর্মী অর্থ ব্যবস্থায়। বিশ-শতকের বাঙালির চিন্তা ও বোধের জগতে নবজাগরণ এলেও সম্পূর্ণরূপে সংস্কার-মুক্তি ঘটেনি। সতীদাহ রোহিতকরণ, বিধবাবিবাহ প্রচলন, হিন্দুত্ব বর্জন, অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ রোহিতকরণ, শর্তসাপেক্ষে স্ত্রীর স্বামী ত্যাগের ক্ষমতা প্রাপ্তি – ভারতীয় আইন ব্যবস্থায় ঘটলেও প্রকৃত অগ্রগতি ঘটেনি। আধুনিকতার আড়ালে রয়ে গেছে ঐতিহ্যের দোহাই। তাই 'নারী-শিক্ষা' দরকার 'উৎকৃষ্ট স্ত্রী' গড়ে তোলার জন্য। যৌথ পরিবারের পুরুষ 'কর্তা' এবং 'নারী' সর্বাপেক্ষা সমঝোতার দায়িত্বে থাকে। মূল্যবোধের ভাঙন, পারিবারিক ভাঙন, ব্যর্থতার দায় – বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারীর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। এই আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জীবনানন্দ দাশের বিচরণ।

জীবনানন্দের ছোটগল্পগুলিকে প্রবণতা অনুসারে চার ভাগে ভাগ করা যায় — ১. প্রেম ভালোবাসার তত্ত্ব, ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে সেই তত্ত্বের সংযুক্তি, ২. দাম্পত্য জীবন, সফলতা-নিষ্ফলতার কথা ভেবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। Happy ending কোন কোন ক্ষেত্রে এলেও তা প্রাণের থেকে আসেনি, ৩. এই পর্যায়ের গল্পে গভীর বিশ্লেষণ আছে, ৪. এই পর্যায়ের গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য ও ভাবনায় নতুনত্ব চোখে পড়ে।

প্রথম ভাগের গল্পগুলিতে – প্রেম অতি উৎকর্ষের জিনিস, একই সঙ্গে তা বেদনারও — এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত। 'নারী' (হাড়-জুড়ানি) কল্পলোকের জন্ম দেয়। শুধুমাত্র শরীরি যারা তারা 'মেয়েমানুষ' (হাড়-জ্বালানি), তাদের শরীর তাই 'মাংস', মাধুরী নেই। স্ত্রী জাতির দুটি ভাগ 'নারী' ও 'মেয়েমানুষ'। কবিতায় এবং গদ্যে বারবার 'মেয়েমানুষ', 'মাংস' শব্দ দুটির ব্যবহার ঘটেছে। 'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালোবাসা' গল্পে সত্যব্রত দেখেছেন ভালোবাসার ভিতরে কোন শান্তি নেই, আছে বেদনা। 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস', 'বিবাহিত জীবন', 'উপেক্ষার শীত' — গল্পে প্রেম-ভালবাসা ব্যক্তি জীবনে এবং দাম্পত্য জীবনে যে বিচিত্র প্রভাব রাখে তার দৃষ্টান্ত আছে। 'প্রণয়-প্রণয়িনী' গল্পে দাম্পত্য জীবনের ওপর আঘাত হানতে চেয়েছে পূর্ব-প্রেমিক। 'জামরুলতলা' গল্পে সন্ন্যাস নিতে আগ্রহী অবনীর জীবনে এক মহিলা রত্নের আগমন ঘটে – যাতে অবনীর জীবনটার রঙই বদলে যায়। গল্পের 'আমি' চরিত্রটির মনে হয় — 'হৃদয়ের রঙ আশ্বিনের ঘাসের মত হয়ে ওঠে।'[১]

দ্বিতীয় পর্বের গল্পগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য – পুরুষ চরিত্রগুলি কমবেশি সর্বত্রই এক ছাঁদের। তুলনায় স্ত্রী চরিত্রগুলি কিছু বৈচিত্র্যপূর্ণ। ব্যবহারিক জীবনে অসফল, চাকরি নেই, একান্নবর্তী পরিবারের অনুগ্রহ-লালিত, স্ত্রী-সন্তান আছে প্রায় সব চরিত্রেরই। স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিমুখ – আপাত ব্যর্থ দাম্পত্যের পটভূমিতে কবির নিজের জীবনের মতই তাদের জীবন সাদা, সাধারণ, 'অনেকখানি কাজের বিনিময়ে অনেক কম টাকা' পায়। সময় পেলে নিঃসাড়ভাবে পড়ে থাকে গভীর স্বপ্ন ও মননের জগতে। স্ত্রী চরিত্রেরা প্রত্যেকে রূপসী – তাদের রহস্যময়তার কথা বোঝাতে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন 'এক-এক রকম পৃথিবী' গল্পে। 'অস্পষ্ট রহস্যময় সিঁড়ি' গল্পে 'আকাশে সাতটি তারা'-র কেশবতী কন্যার ইমেজের সঙ্গে সাপের ইমেজ যুক্ত হয়েছে। 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পে মাকে লেখা চিঠিতে 'আমি' অধরা-মাধুরী চারুলতার কথা বলেছে – যে জীবনের যবনিকার ওপারে কুয়াশামাখা সম্ভাবনার রাজ্যের মমতাময়ী রূপসী। গল্পগুলিতে দাম্পত্য জীবনের অনেক রকমফের

থাকলেও দাম্পত্য-চিত্রের অধিকাংশই ব্যর্থ। সংসারে এসে স্ত্রী প্রথমাবধিই স্বার্থপর। 'বাসর শয্যার পাশে' গল্পে দরিদ্র চারুকে নীহার বিবাহ না করে অর্থবান দেবব্রতকে বিবাহ করে। দেবব্রতের ধনে তার আগ্রহ। কিন্তু দেবব্রতকে স্বামীর স্থান দেয় না, বাসর রাতেই পূর্ব-প্রেমিকের কাছে চলে যায়। 'শাড়ি' গল্পের উষা স্বামী রণজিতের সামর্থ্যের কথা না ভেবেই দামি শাড়ি পড়তে চায়। স্বামীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন তার কাছে তুচ্ছ। 'বত্রিশ বছর পরে' গল্পের স্বর্ণের স্বার্থপরতা অভয়কে আহত করে। স্বামী-সন্তান-সংসার নয়, ভাল খাওয়া-পরাতেই তার অধিক আগ্রহ। 'হাতের তাস' গল্পে বেকার উকিলের স্ত্রী সুমিতার স্বামীতে আগ্রহ না থাকলেও বিবাহবিচ্ছেদে বিশ্বাসী নয় সে – এইসব স্ত্রী চরিত্রের বাস্তবতা গল্পকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। স্ত্রী-রা অতিরিক্ত স্বামী নির্ভর – 'রক্তমাংসহীন' গল্পে। উষা রক্তমাংসহীন পুতুলের মতো – নিজের ইচ্ছায় চলতে চায় না। স্বামী বাধা না দিলে বাপের বাড়ি যাওয়া থামাতে পারে না সে। উষা স্বামীগৃহে ফিরেও আসে না – আসে তার মৃত্যু সংবাদ। নারীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা দাম্পত্যের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ – স্বামীর কাছে শুধুই দাবী, প্রেম-মমতাহীন দাবীর ফলে নির্যাতনের শিকার স্বামীর চরম ঔদাসীন্যে নারীও নির্যাতিতা। দাম্পত্য যখন শুধুই শরীর তখন তা ক্লান্তিকর। 'মেয়ে মানুষের রক্তমাংস' গল্পে লীলা অজিতের মধ্যে বিবাহ পূর্ববর্তী আকর্ষণ অনুভব করে না। অজিতকে সে ভালোবাসলেও বিরক্তি বোধ করে বেশি – কোনোরকম জুড়ে-তেড়ে চলা, ভাঙ্গা যায় না বলে সম্পর্ক বয়ে নিয়ে চলা, অন্তরের আঠা থাকে না সম্পর্কে। 'তিমিরময়' গল্পের জ্যোৎস্নার অচ্যুতের রকম-সকম, শান্ত লেখাপড়ার জগত অপছন্দ – তুলনায় দেবরের টেনিস খেলা, ফুর্তি করা, শিকার করা বেশি পছন্দের। 'সাত কোশের পথ'-এ উর্মিলা-প্রবোধের দাম্পত্যে নেই উষ্ণতা, চমক, বেদনা, বিরক্তি। স্বামীর অসচ্ছলতা, স্বামী-স্ত্রীর উদাসীনতাও দাম্পত্য নষ্ট হওয়ার কারণ। 'চাকরি নেই' - এর সুকুমার গল্প লেখে – দারিদ্রের কারণে কলকাতা ছেড়ে দেশে ফিরলে স্ত্রী নির্মলা স্বামীর দারিদ্র মেনে নিতে পারে না। 'বিবাহ অবিবাহ' গল্পে সরযূ নিস্পৃহ স্বামী ছাড়া সংসারের অন্যদের সঙ্গে ভালো থাকে। 'মেহগিনি গাছের ছায়ায়' গল্পে বৃদ্ধ চাটুজ্যে মশাই একা। স্ত্রী ও ছেলে নিজের মত ব্যস্ত। 'নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ' গল্পে যক্ষ্মা আক্রান্ত অনাদিকে একা রেখে স্ত্রী মেয়েকে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যায়। স্ত্রীর উদাসীনতা ক্রমে দাম্পত্যকে অপ্রয়োজনীয় করে তোলে। 'কিন্নরলোক' গল্পে সুবোধ-সরযূর দাম্পত্য এইভাবে অর্থহীন হয়ে যায়। রূপ ছেড়ে অরূপে যাত্রা করে সুবোধের স্বপ্নাভিসারী মনন।

জীবনানন্দের গল্পের পুরুষ নারীকে ব্যবহার করতে চায় বাধ্য প্রণয়-পুতুল হিসেবে। 'প্রণয় প্রেমের ভার' গল্পে পুরুষ চরিত্র সুবোধের স্ত্রী সতেরো বছরের হেমলতা যৌবনের সাধ-আহ্লাদ হারিয়েছে – স্বামীর কাম প্রস্তাবে সাড়া দেয়নি বলে পুরুষ-মন আহত। সতেরো বছরের মেয়েটি প্রবীণ, কর্তব্য ভারাক্লান্ত – ছেলেমির বয়স তার জীবনে নেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী ও প্রেমিকার সমন্বয়ের সুযোগ নেই – এই বিষয়টি গল্পে নতুন মাত্রা যোগ করেছে এবং এই ব্যতিক্রমী মানসিকতা নারীকে নতুনতর সংকটে ফেলেছে। মধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের ছাঁচে গল্পগুলি গড়ে উঠেছে। নববধূরা তাদের স্থূল মনোবৃত্তি, আত্মকেন্দ্রিক প্রবৃত্তি নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার কাঠামোয় মূর্তিমান বিদ্রোহ। 'বাসর শয্যার পাশে' গল্পে শহরবাসী দেবব্রতর সঙ্গে গ্রামীণ নববধূ নীহারকণার উৎকট সাংস্কৃতিক পার্থক্য – নীহারকণার লোভ, অসহিষ্ণুতা, স্থূল রুচিবোধ ও আক্রমণাত্মক মনোভাব – পারিবারিক যৌথ ভাবনার বিপরীত অবস্থানে জোরদার। বিপরীতে দেবব্রতর পিতৃপরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতা স্বাভাবিক ছবি। 'বাসর রাত'-এও নারীর অর্থলিপ্সায় ছয়-সাত দিনের দাম্পত্য শুরুতেই দুর্বিসহ, বিধ্বস্ত একান্নবর্তী জীবনের ছন্দ। দাম্পত্য এখানে কেবলমাত্র হৃদয় নির্ভর স্বয়ংসম্পূর্ণ সম্পর্ক নয়, বিত্ত-বৈষম্য একে সামাজিক ভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। 'কুষ্ঠের স্ত্রী'-এ সুশোভন উচ্চবংশজাত, সুগঠিত চেহারার পুরুষ। মুখে পোড়া সাদা দাগের কারণে (কুষ্ঠ ভ্রমে) উপযুক্ত পাত্রী জোটে না — আত্মগর্বী হীনরুচির মেয়ে অতসীর লোভ ও অর্থলিপ্সা দাম্পত্যের ভবিষ্যতকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে ফেলে দেয়। সুশোভনের সম্পত্তির অধিকার চেয়ে বসে আচমকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে – দাম্পত্যে মনের মধু তো জমলই না, বরং সুশোভনকে নিয়ে ফেলল 'কল্পনা ও স্বপ্নের দেশ থেকে দূরে।'

'সুখের শরীর', 'নষ্ট প্রেমের কথা', 'বাসর ও বিচ্ছেদ' গল্পেও নারীর স্বার্থপরতা ও আত্মকেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতা, একা-মানসিকতা সুস্থ দাম্পত্য সম্পর্কের অন্তরায়। 'সুখের শরীর' গল্পে ইন্দিরার স্বার্থপরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, সংঘাত ও অশান্তির মূলে – তার শরীর সচেতনতা। মমতাহীন দাম্পত্যের মূলে তার জৈব-মানসিক সঙ্কট। নিরূপম চায় একান্নবর্তী পরিবারের শান্তি, স্বস্তি। ইন্দিরার সৌন্দর্যভাবনায় মাতৃত্ব অস্বীকার করে সত্তর বছরেও যুবতী থাকার সাধ, তার দেহের অধিকার,

সিদ্ধান্তের ক্ষমতা – নিরূপমের পুরুষ মানসিকতায় আঘাত হানে। ‘নষ্ট প্রেমের কথা’ গল্পে নববধূ সুরূপার আচরণেও বিচ্ছিন্নতার মনস্তত্ত্ব স্পষ্ট। 'বাসর ও বিচ্ছেদ' গল্পে পারিবারিক সংঘাত ও বিবর্তনের ছবি এঁকেছেন গল্পকার। সাধারণভাবে জীবনানন্দের গল্পে বিবাহ নির্ভর যৌনতার কোন রোমান্টিক স্বস্তিকর চিত্র নেই। সন্তান জন্মদানে উৎসাহহীনতা, পালনে বিরক্তি। বহু-সন্তানের ধারণা জীবনানন্দের গল্পে অনুপস্থিত। সহমর্মিতা, শান্তি ও সংযমের পারিবারিক আবহ — গল্পগুলিতে আসেনি। বিবর্তিত সমাজ ও দাম্পত্য কাঠামোয় পুরুষ আপন অধিকারবোধে নারীকে আয়ত্তে রাখতে চায়, স্ত্রীর সতীত্বও পুরুষের সম্পদ গর্বের মধ্যেই পড়ে। ষোড়শী বিরজার চল্লিশোর্ধ্ব স্বামী শশধরের সঙ্গে সামাজিক শ্লেষ নিয়েই দাম্পত্য।

পুরুষের ধারণা স্ত্রীকে ঠিক ভাবে গড়ে নিতে পারলে দাম্পত্য অর্থময় হয় – সেই গড়ে নেওয়ার চেষ্টা প্রায়ই অসফল। প্রথম জীবনে রূপশ্রীময়ী মৃণালকে পেয়ে দেবব্রতর ধারণা ছিল এইরকম। কিন্তু পরে দেখলো স্ত্রী আত্মবিশ্বাসী নয়, বিশ্বাসযোগ্যও নয়। ‘নকলের খেলায়’ গল্পে এরকমই ছবি। ‘মা হবার কোন সাধ’ গল্পে রূপসী শেফালীর অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের কথা – তার স্বামী প্রমথ সন্তান চায় না – কিন্তু একবার অর্থনৈতিক সুবিধার কথা সম্ভাবনায় এলে সন্তানের বীজ বুনেছিল তারা – কিন্তু চাকরির সুবিধা হয় না – অথচ সন্তানের জন্মদান অনিবার্য। সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে শেফালির মৃত্যু। মা-মরা সন্তান পালনের আশায় বুক বাঁধে প্রমথ। যদিও সুন্দরী স্ত্রীর সঙ্গে দাম্পত্য তার কাটানো হল না এই সন্তানের জন্যই। আর্থিক অনটনে কোনঠাসা শেফালী-প্রমথর দাম্পত্য। একটা গাইগরু বিয়োলেও তার জন্য পরিবারে যে গুরুত্ব তার সামান্যও জোটেনি শেফালির ক্ষেত্রে। 'প্রেমিক স্বামী' গল্পে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসলেও প্রভাত উল্টো বুঝে স্ত্রীকে দূরে পাঠিয়ে ভালোবাসা গাঢ় করতে চায় – প্রভাতের ভুল সিদ্ধান্তে দাম্পত্য মাঝপথে গতিহারা।

মূলত স্ত্রী চরিত্রগুলির চিন্তাশূন্য, স্থূলরুচি, কর্কশ স্বভাব ও অর্থকেন্দ্রিক বহির্মুখীণতার বিপরীতে স্বামী চরিত্রেরা মননশীল, সূক্ষ্মচিন্তক, আত্মমগ্ন, সৃষ্টিশীল। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে ব্যর্থ। স্বামী-সংসারের প্রতি বিমুখ হলেও স্ত্রীরা মর্মাহত না হয়ে নিজের পথ তৈরি করে নিয়েছে। ‘মানুষের মুখের আভা’ গল্পে পার্বতী শচীনকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। ‘প্রেম, আকাঙ্ক্ষা দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা’-তেও অজয়কে ছেড়ে নির্মলা তিন বছর বাপের বাড়িতে। অজয় ভাবে বিচ্ছেদকে মধুর করে তোলার পরিবর্তে কদাকার করে তুলেছে নির্মালা। অনিচ্ছা, অপ্রেম, অরুচি, অধৈর্য নিয়ে স্বামী-সঙ্গের গ্লানি থেকে সঙ্গ ত্যাগ অধিক শ্রেয় – গল্পে এমনটাই প্রতিপাদ্য। ‘মায়াবী প্রাসাদ’ গল্পে অন্যরকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা – স্বামী-স্ত্রী যদি আকাঙ্ক্ষাহীন, মোহমুক্ত হতে পারে অথবা বিবাহ না করে একত্রে বসবাস করে সেক্ষেত্রে সাফল্য আসলেও আসতে পারে। ‘মায়াবী প্রাসাদ’ এবং ‘ছায়ানট’ গল্পে – সেই সংকেতই ধরা পড়ে।

নারী ও মেয়ে মানুষ সম্পর্কে শিল্পীর মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে বেশ কয়েকটি গল্পে – সেখানে মূল চরিত্র একজন কবি বা কথাচিত্রকর। ‘মহিষের শিং’ গল্পে কবি চারুর সঙ্গে রানী ও শোভনা দুই বোনের সম্পর্ক। কালো রোগা রানী চারুর কবিতা বোঝে, আদর করে। আবার ‘শোভনার চোখের ভেতর আয়েশ রয়েছে যেন দুরন্ত হরিণ’ — চারুর কবিতাকে শোভনা অগ্রাহ্য করে। ‘মাংসের ক্লান্তি’ গল্পে পুরুষ চরিত্র অমূল্য নারীর কাছে কমনীয় অনুভব, সৃষ্টিশীল সংবেদনা ও মানবীয় মহত্বের সন্ধান করলেও স্ত্রী হেমের অবোধ আচরণ ও অহংকারে তা বিনষ্ট হয়। হেম যেন একটা খটকা, অমূল্য কিছুতেই তাকে মেনে নিতে পারে না। ‘ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া’ গল্পে বিরাজ মনে করে – ‘বিয়ে করা আর্টিস্টের পক্ষে মারাত্মক’ — কারণ স্ত্রী কমলার কাছে বিরাজের লেখাপড়া সবসময়ই অন্ধকার জিনিস। ‘করুণার রূপ’ গল্পে কবি ও তার স্ত্রীর দাম্পত্যের আলো-আঁধারি-অস্বচ্ছতা-ছলনার রূপ প্রত্যক্ষ হয়। ‘আর্টের অত্যাচার’ গল্পে নিখিল-অবিনাশ-দেবকুমার তিন জনই সাহিত্য চর্চা করে। ঔপন্যাসিক অবিনাশ ও কবি দেবকুমার মনে করে, ‘লেখক ছাড়া আর কেউ আর্টিস্ট নয়।’[২] যারা ছবি আঁকে তাদের – ‘মনের ভেতর কোনো খটকা নেই, তাহলে ওরা ছবি আঁকতো না, লিখতো।’[৩] নিখিল ভাবে সে কবি, জীবনকে বোঝে কিন্তু আস্বাদ করতে পারে কই – নিখিল আর্থিক সাফল্য পেতে পারত – কিন্তু আর্ট তাকে কিছু হতে দিল না। ‘কারুবাসনা’-র হেমের মতো ‘আর্ট’ তাকেও নষ্ট করে দিল। ‘বেশি বয়সের ভালোবাসা’ গল্পে সুহৃদ কিছুই করতে পারল না, ওর বোন আভা মাস্টারী ছাড়ল, তিনটে প্রেম ব্যর্থ, গল্প-উপন্যাস-কবিতা লেখে। সুহৃদের মতে —

> “লেখা মানুষকে বড্ড নাকাল করে, আমার মনে হয় দু-চারজন লোকের শুধু লিখবার শক্তি থাকে, এক-একটা যুগে, বাকিগুলো পণ্ড পরিশ্রম করছে শুধু।”[৪]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

'শেষ পছন্দের সময়' গল্পে সুবোধ দারিদ্রের পথই বেছে নিয়েছিল শুধুই লিখবে মনস্থির করেছিল। পরিবারের বড়রা সংসারের জন্য যারা প্রাণপাত করে চলেছে তাদের দেখে তার ধারণা বদল ঘটেছে। 'মানুষ অমানুষ', 'কল্প জিনিসের জন্ম ও যৌবন', 'প্রণয়হীণতা' গল্পে সফল লেখকদের বৃত্তান্ত আছে। 'মনোবীজ' গল্পে চন্দ্রপীড়ের কবিতা অমলেন্দু সেনের কাগজে ছাপা হল, তার নাম যশও হল – অন্যেরা তাঁর কবিতা নিয়ে গেল এবং অনেক লাইন বাদ দিয়ে নতুন লাইন যোগ করে নিজেদের মত করে ছাপলো – চন্দ্রপীড় বুঝল দেড়শ বছর না গেলে তাঁর কবিতা কেউ বুঝবে না। নিরাপদ জায়গায় তুলে রাখা উচিত সেগুলো।

নারী, মেয়েমানুষ, মানুষীর সঙ্গে যাপিত জীবনে প্রেমকে ভেবে ভেবে, পারস্পরিক ভালোবাসা, ঘৃণা, উপেক্ষা, প্রেম-অপ্রেমের দোলাচলময় জীবনের যে ছবি এবং তার অতিরিক্ত আর এক জীবনের কথা ছোটগল্পগুলোতে জীবনানন্দ আঁকতে চেয়েছেন 'বোধ' কবিতার সঙ্গে তার মিল পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে থাকা আপাত রূঢ়, খানিকটা পুরুষতান্ত্রিক ভঙ্গিকে পেরিয়ে যদি মর্মে পৌঁছানো যায় তবে দেখা যায় — তিনি চেয়েছিলেন – স্ত্রী জাতি হবে স্বাধীন মনোভাবাপন্ন, সহনশীল, বৃহত্তর পরিসরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো ক্ষমতা থাকবে তার মধ্যে, মানসিকভাবে উন্নত হবে সে – সাংসারিক তুচ্ছতা কাটিয়ে বৃহত্তর পটভূমিতে অংশ নেবার উপযুক্ত হবে। জীবনানন্দ নিজেও এই মানসিকতা অর্জন করতে চেয়েছিলেন। সংসারের কুম্ভীপাকে নিজের মায়ের কবিসত্তার স্ফূরণ যথাযথ না ঘটায় অভিযোগ ছিল তাঁর মনে। 'জীবনের অন্তঃপুর ও তেপান্তর' গল্পে চিঠির ফর্মে লেখা 'আমি'-র অভিযোগের সঙ্গে এই প্রসঙ্গের মিল পাওয়া যায়। 'পৃথিবীটা শিশুদের নয়' গল্পটিতে গাঢ় বেদনার ছবি আছন্ন করে পাঠক মনকে। 'মজলিশে' গল্পের অমলা 'নারী' থেকে 'মেয়েমানুষে' পরিণত হয়েছে। 'পেঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' গল্পে কল্যাণী বিচ্ছেদ, নিঃসঙ্গতা বিষয়গুলি বড় একটা বুঝত না – সন্তানহীনতার জন্য গঞ্জনায় অভিমানে আত্মহত্যা করে সে। 'অঘ্রাণের শীত' গল্পে উমা জীবনটাকে অন্যরকম ভাবে দেখে – জীবন বিশ্বাসী হয়েও সংসারের দুর্বিপাকে বাঁচাতে পারে না নিজেকে। 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-তে শচী প্রকাশের স্ত্রী, বহুবল্লভ তার স্বামী প্রকাশ ও পূর্ব-প্রণয়ী সোমেনের মধ্যে তুলনা করে সোমেনের প্রতি আগ্রহ ত্যাগ করতে পারে না, স্বামীকেও ছাড়তে পারে না। খানিকটা 'মাল্যবান'-এর উৎপলা-মাল্যবান দাম্পত্যের মতোই। অথবা সুরেশ-মহিমের মাঝে অচলা। 'বাইশ বছর আগের ছবি' গল্পে চপলার বার্ধক্যহীন অনিঃশেষ প্রেম দ্বিজেনের আমৃত্যু বেদনার উৎস। অপ্রাপ্তির কারণে চপলা ও তার প্রেম চিরজীবনের ঐশ্বর্য লাভ করেছে দ্বিজেনের স্বপ্ন কল্পনার সংবেদনায়। কবিতায় যেমন বনলতা সেন, সুচেতনা, শ্যামলী – গল্পে তেমন চারুলতা, মালতীলতা, চপলার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যারা গল্পকারের চেতনার নারী এবং খানিকটা শরীরী অস্তিত্ব নিয়ে উপস্থিত। 'বিলাস' গল্পটি খানিকটা স্বতন্ত্র, চুয়াল্লিশ বছরের শান্তিশেখরের দুটি অতৃপ্তি – প্রথম, অনেক বই তার সংগ্রহে আছে যা কোনদিন পড়া হবে না, দ্বিতীয়, কাঙ্খিত নারীর সন্ধান না পাওয়ায় – কোনো নারীকে না-ভালবেসেই তাকে জীবন ত্যাগ করতে হবে। প্রেম ও যৌনতার পথ সন্ধান করলেও তার 'নারী' সাধারণ মেয়ে-মানুষ নয়। শান্তিশেখরের জন্য সংসার উপযুক্ত স্থান নয় – কল্পলোকের আদর্শে নির্মিত নারীই তার জীবনাবেগ ও চলার পথের প্রেরণা। কাদাখোঁচার মতো নয় রাজহংসীর সন্ধানে অক্লান্ত শান্তিশেখর, এভাবেই রক্তমাংসে নয় জীবনানন্দের ছোটগল্পে পুরুষ কোনো এক শাশ্বতীকে সন্ধান করে – যে সৃষ্টিশীল মানুষের চির অদৃপ্তির উৎস। আত্মস্থ এবং অনুচ্চারিত অনুভবে প্রেমের মুক্তি – প্রাত্যিকতায় নয়।

শুধু ছোটগল্পগুলিতে নয়, অনেক উপন্যাসেরও সম্পাতবিন্দু নিরর্থক নষ্ট-দাম্পত্য। উপন্যাসগুলির উপাদান বহুলাংশে আত্মজৈবনিক। উপন্যাসে জীবনানন্দ দাম্পত্যের যে ছবি আঁকলেন সেখানে সুস্থ দাম্পত্য খুঁজে মেলা ভার। এইসব বিচ্ছিন্ন চরিত্রগুলির ভাঙাচোরা দাম্পত্যের চিত্র প্রায় সব উপন্যাসেই কম বেশি আছে – 'কল্যাণী', 'কারুবাসনা', 'নিরুপম যাত্রা', 'সুতীর্থ', 'জলপাইহাটি', 'বাসমতীর উপাখ্যান', 'মাল্যবান'। বর্তমান আলোচনায় প্রধানত 'মাল্যবান' উপন্যাসে প্রতিফলিত জীবনানন্দের দাম্পত্য ভাবনা স্থান পেয়েছে। মাল্যবানের চিন্তায় এসেছে বিভিন্ন বিষয় – ফেলে আসা গ্রাম, বাঙালির সম্মান, সমাজবিপ্লব, জীবনের সার্থকতা – ইত্যাদি প্রসঙ্গ। অন্তর্মুখী, অবহেলিত মধ্যবিত্ত মাল্যবানের আরেকটি দিক বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে – যৌনতৃষ্ণার তীব্র সুখ ও তীক্ষ্ণতর যন্ত্রণা। শতকরা নব্বই জন বাংলাদেশের দম্পতির জীবনের নিষ্ফলতার প্রতীকী চিত্র উৎপলা-মাল্যবানের দাম্পত্য। না-দাম্পত্যের উপন্যাস 'মাল্যবান' - এ বিবেক ও বিবেকহীনতার প্রসঙ্গ আদ্যন্ত

OPEN ACCESS Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জাগ্রত। জীবনানন্দের নায়কেরা রমণী খুঁজে পায় না, ভালোবাসার রাজপ্রাসাদের নিশুতি রাতে গুমরে কাঁদে প্রেম – নারী পুরুষের সাথে বা পুরুষ নারীর সাথে মিলতে পারে না সহজ সমীকরণে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ মানুষেরও আত্ম-ভাবনার জগতে বিচরণের ইচ্ছেটা নৈতিক। শুরুর দিন থেকে বেশ করে উল্টে-পাল্টে, নেড়ে-চেড়ে, চটকে-ছেনে মাঝবয়সি কোনো মানুষ দেখতেই পারে তার নিজের জীবনটাকে – 'কী চেয়েছি আর কী যে পেলাম' – কী চায় সে? কী পাবে – প্রশ্নের সমাধান খুঁজতে মাল্যবানের যাত্রা –

> "আজ বিশে অঘ্রান', মাল্যবান বললে, 'পিতৃলোক মাতৃলোক মিলে জন্ম তো দিলেন; ঢের ভালো ব্যবহার হতে তো পারে জীবনের; তা হয়েছে; হয়নি? হবে? বোঝা কঠিন; মাঝে-মাঝে তুচ্ছ বেনে-বৌ পাখির চেয়েও বেশি বেনেতি বলে মনে হয় সব, খাচ্ছি-দাচ্ছি সংসারের বেনেগিরি করছি। আছে অনেক ফাঁক, আলো, নানা রকম বড় আকাশ ঘাস ও-সব পাখিদেরও; কিন্তু সালতামামি আর সালপাহলির গোলকধাঁধা ছাড়া কিছু কি আছে মানুষের?"[৫]

বস্তুপৃথিবীর নারী উৎপলার সঙ্গে বারো বছরের দাম্পত্য জীবনে সমানভুতি সমাশ্রয়ের অভাব। উৎপাদন ন'বছরের কন্যা মনু, তাদের দাম্পত্যজনিত যৌন সম্পর্কে নোঙর পড়ে গেছে। বিয়ের পর থেকে খুব অল্প দিনই স্বামীর কাছে থেকেছে উৎপলা। স্ত্রীকে প্রশান্তির জল হিসেবে পেতে চাইলেও সে বধির, নিশ্চল। না আছে ভালোবাসা, না আছে যৌনতার উত্তাপ। দুটি প্রাণীর আলাদা জগত, আলাদা আস্তানা একই বাড়িতে। মাল্যবানের সহবাস বিনিদ্র রাতে শহরের বিভিন্ন শব্দাশব্দির মধ্যে – চুনবালি খসা, অপরিচ্ছন্ন ঘরে – টিকটিকি, মাকড়সা, আরশোলা, ইঁদুর, মশাদের সঙ্গে। মাল্যবানের বকলমে জীবনানন্দও যৌনতাহীন ভালোবাসায় বিশ্বাসী নন – শরীরের সুখোস্বাদই ভালোবাসা, তাতেই অস্তিত্বের সার্থকতা বোধ চরিতার্থ হয় –

> "আমি মাটির মানুষ তো-মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না - হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভালো, তার চেয়ে মাটির শরীর; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কপ্পুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মতো তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই, বসেছি তাই। দাও। দেবে না?"[৬]

ইতর প্রাণীর তুলনায় মানুষের কাম চরিতার্থতা সম্পর্কে বরং মাল্যবান ভাবে – সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে নাচিয়েই মানুষ তো হয়েছে মানুষ। জীবনানন্দের অন্য সব নায়কদের মতো মাল্যবানও স্বরচিত কল্পনার বৃত্তে বুঁদ থাকতে ভালোবাসে – যতদিন পাড়া গাঁয়ের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল তার অস্তিত্ব – তার দেখাবার শোনাবার জিনিসগুলো ছিল সূক্ষ্ম, অতল সংবেদনময়, প্রকৃতিমগ্নতায় স্নিগ্ধ রঙের 'ওয়াস চিত্র'-র মতো। যার স্তরে স্তরে সযত্ন রঙের বিন্যাস খেলে যায় – সে সব মুহূর্তগুলো বিয়াল্লিশের দিনগত পাপক্ষয়ের বর্তমান স্মৃতি মেদুরতা নিয়ে ফিরে ফিরে ইঙ্গিতে ছুঁয়ে যায়। এসব কিছুকে ঢের পেছনে ফেলে গত পনের বছরে মাল্যবান খাটছে, খিদমদগারি করছে বটমলি বিগল্যান্ড ব্রাদার্সের অফিসের জন্য – কারণ পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি। এই বড় কঠিন বাস্তবের অন্তরে যে মন – সেটা চেয়েছিল অন্যরকম – অন্য কিছু হতে। রুচি শিক্ষা অনুসারে সেই জীবন স্বপ্নই থেকে যায় – এই অসুখ ক্রমে বাড়তে থাকে। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে যায় – এ হল মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনের অভিশাপ। 'সূক্ষ্ম মনে দুঃখ বেশি' বলেই অনিবার্য অন্তর্দহন, আকাঙ্ক্ষা মতো শান্তিময় প্রেমময় জীবন পায় না মাল্যবান। মাটির নীচে গেঁড় কন্দ খাওয়া শুয়োরের মতো অফিসগিরির জীবন বয়ে চলে। স্ত্রী-স্বামীর যৌথ বোঝাপড়ার জীবন নয়, 'সাপটে না খাবে তো জাপটে ধরব' দশা নয়, এখানে প্রেমের শতদল টলমল জলে ফোটে না – গন্ধে-রূপে-রসে ভরে ওঠে না – এখানে শুধুই বিবর্ণতা, তীক্ষ্ণ হৃদয়হীন আশ্লেষ, কিছু ঘৃণা, অবজ্ঞা, দূরত্বের প্রাচীর, তীক্ষ্ণ বাক্যবান প্রতিমুহূর্তে সপাট চাবুক মারে সময়ের স্নিগ্ধতাকে, মাল্যবানের দুনিয়াদারীকে। 'পরানে পরান বাঁধা' ভাব আপনা-আপনি চটকে যায় – মৃত্যুর-কঠিন হিম-শীতলতা ঘিরে ধরে। মধ্যবিত্ত পরিবারের কলেজে পড়া উৎপলার মাল্যবানের সঙ্গে বিবাহ বিধিলিপি, অথচ স্বামীকে মেনে নিতে পারে না স্ত্রী। টেররিস্ট অনুপম তার কামনার মানুষ 'স্ফটিক জল'। মাল্যবানের সঙ্গে সম্পর্ক গরুর মুত – যার সংস্পর্শে উৎপলারূপী দুধ নষ্ট হয়েছে। স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কে অনুরাগ কোনকালেই জন্মায়নি –

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

তাই উৎপলার যাবতীয় অপ্রেমের উক্তি একই সুরে বাঁধা। অপ্রেম উৎপলার কথার ধার বাড়িয়ে তুলেছে ক্রমাগত। যেসব কথা লোকে বাইরে নয়, মনে মনে বলে সেই অন্তর্বাস্তবটা সংলাপে প্রতিফলিত। উৎপলার প্রশস্ত খাটে শীতের রাতে স্বামী অবাঞ্ছিত —

> "একটা ডান যেন। ...আ, গেল যা! বসলে। রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ। ...বেরোও বলছি! ...ঘুম হচ্ছিল না বলে পরের ঘুমের নিকুচি করতে হবে?"[৭]

বিয়াল্লিশ বছরের জন্মদিনের বিশেষ রাতটিকে অন্তরঙ্গে স্ত্রীর কাছে যে জীবন-সঙ্গ-প্রেম তার আকাঙ্ক্ষা – উৎপলার তাল তার সঙ্গে আগে কিছু কিছু মিললেও – বর্তমানে উৎপলার সঙ্গে অনুভূতির সমতা নেই, সরসতা নেই – উৎপলা অনিবার্য – অথচ প্রায় অধরা। তিক্ততা, অপ্রেমে ভরা দম আটকানো দাম্পত্য –

> "এক জন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে এতটা দম আটকে আসত না আমার-"[৮]

ক্রমে ছক ভেঙে কেরানির ডেক্স ও উৎপলার স্বামীত্ব থেকে নিজেকে ঘুঁচিয়ে মেঠো ইঁদুর বা মুনিয়া পাখির জীবন পেতে চায় মাল্যবান। উৎপলার মেজদা-মেজবৌদির জন্য উৎপলা নিজের ঘর ছাড়বে, কৌশলে আগে থাকতেই ভাড়া করে নিয়েছে একটি ঘর। মাল্যবানও ঘরছাড়া হবে মেজদার ছেলেমেয়েদের জন্য – সেখানে উৎপলার জায়গা হলেও মাল্যবান বাড়তি। বাপের বাড়ির কোলে ঝোল টানা উৎপলার ব্যবস্থাপনায় ক্রমাগত নিশ্বাস ভারী হতে থাকলেও উৎপলাকে পাল্টা দেয় না মাল্যবান। এই নারীকে নিয়ে কী করবে সে? শুধু স্বামী হিসেবেই অসহায়, বিরস নয় – বাবা হিসেবেও সন্তানের প্রতি হওয়া অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে না পারা মাল্যবানের ছটফটানি বাড়ায়। অতৃপ্তির আগুনে অম্বলে-কাদায়-দধিতে মাখামাখি এই জীবনের থেকে পাখির হালকা স্বাধীন জীবন তো বেশ চমৎকার ছিল। কিন্তু, একা আইবুড়ো থেকে জীবন কাটানো খুব শক্ত তার পক্ষে।

উৎপলার জীবনের বিতিকিচ্ছিরি নিষ্ফলতা মাল্যবানকে ভাবায়। বেজোড় পাখিনী এসে পড়েছে ভুল করে মাল্যবানের জীবনে, মাল্যবানের সঙ্গে হৃদয় বিনিময় হয়নি তাই 'পিতৃগ্রন্থী' অধিক সক্রিয় উৎপলার।

মাল্যবান-পত্নীর ধনবিজ্ঞান সচেতনতা চোখে পড়ার মতো। বাপের বাড়ির যত্ন-আদরের ত্রুটি তার সইবে না – মাল্যবানের সোনার বোতাম বিক্রি হয় – উৎপলা খুশি হয় – চিড়িয়াখানায় যায় মাল্যবান স্ত্রী-কন্যা সমেত। কিন্তু মাল্যবানের জন্য মন বা প্রেম বাজে খরচ করতে অরাজি। চিড়িয়াখানায় গিয়েও বিপরীত অবস্থানেই। বেশি বয়সের মাল্যবানকে মেসো বা মামাশ্বশুরের মত লাগে উৎপলার পাশে – মাল্যবানের হ্যাট টাই না পরা, না কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি – সবেতেই সমস্যা উৎপলার। মাত্রা, দৃঢ়তা সবেতেই অভাব মাল্যবানে। হাতি দেখে মাল্যবান মুগ্ধ – উৎপলার কাছে হাতি অসাধ ও অস্বস্তির। মাল্যবানের চোখে লক্কা পায়রার মত মেয়েরা 'ছেনাল' আনন্দ আমোদের ইষ্টিকুটুম, তারাই উৎপলার গুরুত্বের বিষয়। সিনেমা দেখা নিয়েও দুজন দু প্রান্তে – বক্সের টিকিটে বসে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায় উৎপলা – মাল্যবানের কাছে তা মিছামিছি পয়সাবাজি। উৎপলার চুয়ান্ন বছরের বৌঠানের মা হওয়ার খবরে প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে টাকা তুলে বেনারসি আসে অথচ মাল্যবানের জন্ম নিয়ে তার মাকে জড়িয়ে অসম্ভব রকম কটু কথার বিষ উগরে দেয় উৎপলা।

মানুষ বড় হলে জননীগ্রন্থী স্বাভাবিক নিয়মে গুরুত্ব হারায় – বিয়ে না করলে চলে না, অথচ মাল্যবানের জন্য উৎপলার মনে অপ্রেম অসীম – বিয়ের আগের পৃথিবীর কথা ভাবতে থাকে সে। ঘরজোড়া নম্র বশ্য স্নিগ্ধতার বদলে বিবাহিত জীবন হল খড়ঘরে আগুন, অগ্নি ডাইনির মতো, নির্লজ্জ-নির্মম-ভুল-সত্য –

> "মানুষ তো মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে, পিছে ফিরে যেতে পারে না তো সে আর। তবে উৎপলা মনুকে বাদ দিয়ে মৃত্যুর দিকে এগোতে পারা যায় বটে — একা। মার আমলে পারেনি, কিন্তু বৌ পায়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে তাকে : সজ্ঞানে হেঁটে চলে যেতে পারে সে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে — অজ্ঞান মৃত্যুর দিকে।"[৯]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উৎপলার ঘরে বিচিত্র মানুষের আনাগোনা, ঠাট্টা রগড়ের ফোয়ারা – মাল্যবান গাছেই তাদের আশ্রয়। এইভাবে প্রেমস্পর্শহীন সমান্তরাল ধারায় দাম্পত্য বয়ে যায়। সত্যের অন্তরালে থাকা সত্যটা হল – উৎপলার বহুগামীতা। সহকর্মীর স্ত্রীর অসুস্থতায় চিন্তিত হয় মাল্যবান উৎপলার সুস্থতা নিয়ে। অফিস থেকে হ্যাঁচকা ছুটি নিয়ে বাড়িতে ফিরে স্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে খবরাখবর নিতে চায় – গড়ের মাঠে বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রস্তাব থমকে যায় শ্রীরঙ্গের আগমনে। বিয়ে না হওয়া গাইয়ে-বউ নবনী মল্লিকের কাছে বেহালা শিখে উৎপলাকে শোনাতে এসেছে। শ্রীরঙ্গ শ্রীমন্ত সদাগর – উৎপলা কমলেকামিনী – এরকমই রঙ্গরসে উৎপলার দিন কাটে।

প্রতিবেশী সত্যেনের চব্বিশ-পঁচিশের স্ত্রী রমার মৃত্যু, স্বামীর শোক – উৎপলার তিরিখ-তিরিখ বোলচাল - সব অনির্বচনীয় সময়ের গর্ভে লীন হয়ে যায়। থাকে শুধু অফুরন্ত সময় – আসলে সুসময়কে ধরতে চান জীবনানন্দ —

> "একটি স্বামীর শোক খুবই জায়াকেন্দ্রিক, এখনও গভীর। কিন্তু এখনই তরল হয়ে যাচ্ছে সব; স্বচ্ছল সফল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তি জীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময় - সময় শুধু।"[১০]

ভাবতে গিয়ে দার্শনিক হয়ে যায় মাল্যবান —

> "আমাদের জীবনের নদীর নাম - অনুত্তরণ, মাল্যবান ভাবছিল, কোথাও কেউ উত্তীর্ণ হতে পারে না, কোনোদিন এ-নদীর পথে; কিন্তু, তবুও, কত লোক ব্যথা বিপদ বিফলতা মৃত্যুর বলে প্রতিদিন ওতড়াচ্ছে।"[১১]

নিজেকে ঠিকমত ভাবে প্রকাশের শক্তি তার নেই – সূক্ষ্ম গভীরতর কিছু বলা হয়ে ওঠে না শেষ পর্যন্ত উৎপলাকে। উৎপলার রাডারে ড্যামেজ এলিমেন্ট মাল্যবান, খারিজ হয়ে যাওয়া মানুষ – নেতা জোব্বার মতো নেতানো। সংসারের কর্তা সে - তার টাকাতে ঠাকুর চাকর নিয়ে উৎপলার রাজ্যপাট-সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু উৎপলার ভাবনা তালিকার বাইরে মাল্যবানের ভালো-মন্দ। মোচড় দিয়ে ওঠা মনটাকে শাসন করতে নিজের ঘরের হাল নিজেই ফেরাতে চেষ্টা করে অসুস্থ হয়ে পড়ে মাল্যবান – কামস্পর্শহীন জায়াঘ্রাহীন অনন্তকে পাবার আর্তি তার পুরো হয় উৎপলার উপস্থিতিতে – এতেই তার অসুখে শান্তি, সব সুখ। মাল্যবান অনুভব করে –

> "...সময়ের কোনো শেষ নেই তো, ...সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহুতার ভেতর তোমার মা-রূপ ফুটে উঠল তো..."[১২]

কিন্তু ক্ষণস্থায়ী এই সুখ। মাল্যবানের সূক্ষ্ম অনুভবের, অন্তরের রক্তক্ষরণের খবর রাখে না উৎপলার লোকায়ত মন। মাল্যবান সম্পূর্ণ পৃথক মাত্রার মানুষ –

> "মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও; সে-জিনিশটা খুব নিয়ন্ত্রিত নয় যদিও। কাজেই চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের ওপর আরো একটি ইন্দ্রিয় আছে খুব সম্ভব মাল্যবানের। বিজ্ঞানে যাকে বলে চতুর্থ বিস্তার,"[১৩]

সন্তান জন্মের আগে উৎপলাকে মাল্যবানের খামখেয়ালি কথা অবশ করত – কিন্তু ক্রমে 'নারিকেল ঝুনা' হয়েছে – উবে গেছে হৃদয়ের মধুরতা, বুকভরা স্নেহ ভালবাসা, রাত জেগে স্বামী সেবা করার পরিস্থিতি নেই আজ – মাল্যবানের প্রায় নতুন ধুতি (সাবান দিয়ে কেচে রাখা) দিয়ে বমি সাফ করে – মানুষটাকে নিষ্পেষিত করতে, নির্যাতন করতেই তার এই কাজ। তারপর মাল্যবানের ডাককে অগ্রাহ্য করে – ওপরে 'আরো ওপরে... মিশে গেল কোথায়।' উৎপলা-মাল্যবানের বিয়ের প্রশস্ত খাটে উৎপলার মেজদা-বৌঠান একসঙ্গে শুয়ে শান্তি পায়, শান্তি খুঁজতে চায় না উৎপলা। বিয়ে নামক চুক্তিতে সে ঠকে গেছে। মাল্যবান বারবার আলো জ্বালাতে চায় 'নিভে যায় বারে বারে'। স্ত্রী পরিত্যক্ত নচ্ছার মানুষ বলে নিজেকে দেখাটা সয়ে নিয়েছে। ক্রমে রাত গভীরে ভালোবাসা না পেয়ে নিজেকেই বেশি ভালবাসতে লেগে যায় সে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 21
Website: https://tirj.org.in, Page No. 197 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ময়ূরকণ্ঠী নীলে অনির্বচনীয় উৎপলাতে নৃত্যরত উত্তরা-বৃহন্নলার সঙ্গে গোলমাল হয়ে যায়। কিন্তু বিছিন্ন উৎপলা-মাল্যবানের দাম্পত্যে সেই জীবনছন্দ নেই – বড় বেশি রকমের স্থির সম্পর্ক। কালোকিষ্টি রাতে বা জ্যোৎস্না রাতে পরীতে পাওয়া একজোড়া ধাড়ীর কৃতকর্মের ফসল বিড়ালছানা – যেটার প্রতি ধাড়ি জোড়ার কোনো দায়িত্ব নেই – মানুষের পৃথিবীরও সেই দশা। স্নেহ-প্রীতি হীন সমানুভূতি হীন অপ্রেমের রাজ্যে মানুষের বাস। ভাবতে ভাবতে অনবরত কান্নার পেনপ্যানানিতে মাল্যবানের ঘেন্না ধরিয়ে দিল সেই বিড়ালছানা – এক আছাড়ে ভবলীলা সাঙ্গ। কাদা পাঁকের ভেতরে শুয়োরের মতো ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করা জীবনে বিড়ালছানার মৃত্যু তাকে বেশ একটা চমৎকার মুক্তি দিয়েছিল; 'স্ত্রীর মমতা বিমুখতার ঢের ওপরে চলে গিয়েছিল সে' - কিছু মাত্রায় নির্বাসনা হওয়া অভ্যাস হয়েছিল – ভারহীন অন্তর্লঘু শিমুল তুলোর ওড়াউড়ির স্বাদ পেয়েছিল। মৌমাছির পাখায়, দূর আকাশের পাখির ডানায় নিঃসীম 'নিঃঝুম পরলোকের দেশে'। এক নির্বেদ অবস্থা। দুঃখকে জয় করতে গেলে আগে আকাঙ্ক্ষা শূন্য হওয়ার যে শর্ত অষ্টাঙ্গিক মার্গে আছে – প্রায় তার কাছাকাছি।

মাল্যবানের ঘরে রসে-বসে রক্তমাংসে পরিতৃপ্ত জীবন কাটায় মেজদা-বৌঠান। উৎপলার খুশির জন্য মাল্যবানকে শরীর-মনের অরুচি ও অস্বস্তি নিয়ে সাত মাস থাকতে হয় মেসে। অসুখী মাল্যবান দম্পতি মেজদা-মেজ বৌঠানের সুখের পালে হাওয়া লাগায়। অথচ জীবনের অর্থ খুঁজে পায় না – যৌনবোধ চিমড়ে লুচির মতো নেতিয়ে যায়। মেসের সাত মাসে বিকৃত কামনার বেশ কিছু খণ্ড-চিত্র এঁকেছেন ঔপন্যাসিক – রাতবাতিকের লোক, সংসার করার শক্তি নেই এমন লোক, সরস্বতী পুজোর বাই নাচ, মেসের ঝিকে জোর করে মদ গেলানোর ছবি, মেসের বোর্ডার, ঠাকুর, চাকর সকলের সঙ্গে ঝি-গয়মতির গতরের সম্পর্কের কোলাজ, ছিপছিপে যুবক যে শেষরাতে রাস্তা দিয়ে যায় কবিতা আওড়াতে আওড়াতে ইত্যাদি ছবি।

মাল্যবান 'একটু উষ্ণতার জন্য' বারবার কাছে আসতে চাইলেও, উৎপলা – সহজ মানুষের পাশে মানুষী নয়, ষড়যন্ত্রী-অস্বচ্ছ-সুযোগ সন্ধানী নেকড়ে বা হায়না বা আরও নিচু প্রবৃত্তির। প্রেমহীন দীর্ঘজীবন কামনা করে না মাল্যবান। উৎপলার বরং বেঁচে থেকে ঢের লাভ – মেলা লোকজনের সোরগোলে মুখর তার কুঞ্জ। উৎপলা তাদের নিয়ে নরকে বসলেও তার পাশে একশোটা নষ্টচন্দ্র। এমন নির্মম দাম্পত্য পরিবেশ শিল্পীত ভঙ্গিতে এর আগে বাংলা উপন্যাসে আসেনি। মাল্যবানজাত কন্যাও চরম অযত্নের শিকার। করুণাহীনতার চরম এই সংকটকালে এক সর্বাত্মক করুণায় মাল্যবানের মন ভরে ওঠে – অপ্রেমের বদলে প্রেম, করুণাহীনতার বিপরীতে সর্বজীবে করুণা – এমনকি তা থেকে বঞ্চিত নয় তার স্ত্রী উৎপলাও।

সাত মাস পরে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করে দাম্পত্য-নাট্যে নতুন চরিত্রের আগমন দেখল মাল্যবান – পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশের লম্বা চেহারার বিবাহিত উচ্ছৃঙ্খল অমরেশ, হিমাংশু বা শ্রীরঙ্গ থেকে আলাদা। ইন্দ্রিয়জ ডাকে প্রকাশ্যে ও নির্দ্বিধায় শরীরে শরীর জড়িয়ে তৃপ্তির সন্ধান পেয়েছে দু'জনে। উৎপলার 'সরমসরসতা'ময়ী ভাব, আহারে অরুচি, অন্যমনস্কতা, চোখে শূন্য দৃষ্টি, কথার ধার কমেছে, বেশবাস স্খলিত — যেন ভিন্ন কিছু ইঙ্গিত করতে চান ঔপন্যাসিক। আজকালকার এই শিশ্নোদরতন্ত্রী এবং যা শিশ্নোদর নয়, কিন্তু তবু 'উচ্ছৃঙ্খল' -এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের শক্তি নেই মাল্যবানের – তার রাগ ক্ষোভ চুরুটের নিভে যাওয়ায় ধরা পড়ে। অমরেশের সঙ্গে উৎপলার আলাপ কীভাবে – জানতে 'মাল্যবানের স্বামীসত্তা, পুরুষ সত্তা মাঝে মাঝে চিতার মত জাগে, ঝিমিয়ে যায় বিড়ালের মতো। স্ত্রীর ভিন্ন পুরুষে আসক্তি প্রত্যক্ষ করেও প্রেমহীন দাম্পত্য বয়ে চলে। লম্পট, রুচিহীন অমরেশের অনিবার্য টান, মাংসের-রক্তের কানায় কানায় সাড়া জাগানো যৌনতা, উৎপলার অধিক আগ্রহের। স্বামী-স্ত্রীর একনিষ্ঠ থাকার সমাজ-শাসন টপকে যাবার ছবি এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। স্বরচিত বৃত্তে বুঁদ হয়ে ফাটা ডিমে তা দেওয়া উটপাখির মত। মাল্যবান-অমরেশ-উৎপলার সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করার পরও স্ত্রীকে নির্দোষ ভাবতে চায়, বিশ্বাস করতে চায়। জীবনের সৎ-অসৎকে ঘিরে এই বিশ্লেষণ মাল্যবানকে শালগ্রাম শিলার মতো স্থানু করে রেখেছে। অমীমাংসিত প্রশ্নের ঝড়ে এলোমেলো মাল্যবানের ঘুম এল, অজান্তে স্বপ্ন এল, স্বপ্নে খড়ের বিছানায় 'হাঁস-হাঁসিনে'র মতো চমৎকার আলোড়িত লম্বা অনন্ত এক শীত-রাত কাটাল দু'জনে। দু'জনার ইচ্ছুক অনুগত শরীর নিয়ে যে মিলন (?), চরিতার্থ দেহমিলন সকল সময়কে ছেদ করে চলে গেছে। স্বপ্নের সহবাসে সুখ, ওম। বাস্তবে হবে না – মাল্যবানের নিঃসঙ্গতার কষ্ট

উৎপলা উপলব্ধি করবে না, জেনেও সঙ্গ দেবে না। কোনটা সত্যি? স্বপ্নের ভিতর শুয়ে কথা বলা, না এঁটো টেবিলে ঘুমন্ত মাল্যবানকে পরিত্যাগ করে উৎপলার বিছানা করে ঘুমিয়ে পড়া?

'সত্যিই কি কিছু হবে না, কিছু সে করতে পারবে না।' শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয় আর হবে না। গভীরতর সংকট ঘনীভূত হয়, এক হিমশীতল নিদ্রায় মৃত্যু ঘোরের মধ্যে ডুবে যেতে থাকে – 'বহিয়া বিফল বাসনা' – প্রসন্নতাহীন, প্রশান্তিহীনতায়, নিরাশ্রয় এলোমেলো। উৎপলা-মাল্যবানের যৌন-চেতনার গল্পে বাৎসল্যের প্রবেশাধিকার নেই। যে উৎপলার মধ্যে সজারুর ধ্যাষ্টামো দেখেছে তার মধ্যেই নব ময়ূরীর রূপও দেখে মাল্যবান – অস্তিত্বের ভাঁজে ভাঁজে বৈপরীত্য। বিষন্ন হয়েও মাল্যবান অবসাদের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও 'স্বচ্ছল সফল' সময়কে খোঁজে। এভাবেই বেঁচে থাকে মাল্যবান, মাল্যবানেরা।

Reference:

১. দাশ, জীবনানন্দ, জামরুলতলা, জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র, সম্পা., দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭, পৃ. ৪১৮

২. দাশ, জীবনানন্দ, আর্টের অত্যাচার, জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র, সম্পা., দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭, পৃ. ১১৮

৩. তদেব, পৃ. ১১৮

৪. দাশ, জীবনানন্দ, বেশি বয়সের ভালোবাসা, জীবনানন্দ দাশের গল্পসমগ্র, সম্পা., দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, কামিনী প্রকাশালয়, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা ২০১৭ পৃ. ১৬৬

৫. দাশ, জীবনানন্দ, মাল্যবান, জীবনানন্দ দাশ তিনটি উপন্যাস, সম্পা., দেবেশ রায়, প্রতিক্ষণ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৫, কলকাতা ১৪, পৃ. ১৩৬

৬. তদেব, পৃ. ১৩৬

৭. তদেব, পৃ. ১৩২-১৩৩

৮. তদেব, পৃ. ১৫৫

৯. তদেব, পৃ. ১৮৬

১০. তদেব, পৃ. ১৯৬

১১. তদেব, পৃ. ১৯৭

১২. তদেব, পৃ. ২০৪

১৩. তদেব, পৃ. ২০৫